

## বিদ্রোহীঃ আমিদের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

মোঃ হারুন-অর-রশীদ

১.০ নজরুলের জনপ্রিয়তম অভিধা বিদ্রোহী। এ অভিধায় অভিহিত হওয়ার অন্যতম কারণ নিজের সম্পর্কে তাঁর সপ্রতিভ কতিপয় উক্তি, “আমি বিদ্রোহী ভূণ্ড, ডগবান বুকে ঐকে দিই পদচিহ্ন;/ আমি স্রষ্টা সৃদন, শোকতাপ হানা খেয়ালী বিধির বন্ধ কবির ভিন্ন।”<sup>১</sup> “খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া/উঠিয়াছি চির বিশ্বয় আমি বিশ্ব-বিধাত্তীর।”<sup>২</sup> “আর একটি কারণ তাঁর বাঁধ ভাঙ্গা আত্মপরিচিতি। “আমি সহসা আমারে চিনেছি। আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।”<sup>৩</sup> শৃঙ্খল ভেঙেছেন তিনি; পান থেকে খসিয়েছেন সংস্কারের চুন। সর্ববিধ বন্ধন মুক্তি নজরুল চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অপরিমেয় আত্মশক্তি আর বিপুল আত্মবিশ্বাস তাঁকে করে তুলেছিল অকুতোভয়, নির্ভীক এবং অনমনীয় আপোষহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

তাঁর বিদ্রোহ বহু ব্যাপক-স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ব্যাপী। মানব সত্তা থেকে বিশ্ব সত্তা পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর বিদ্রোহের অভিপ্সা উচ্চকিত নিনাদে উচ্চারিত। সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক নৈরাজ্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধর্মীয় ভভামি, নির্লজ্জস্বাবকতা, ব্যক্তিত্বহীনতা, মূল্যবোধের অভাব, শোষণ, নিপীড়ন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, হিন্দু-মুসলমান সংঘাত, নারীর মূল্য, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রভৃতি অজস্র বিষয়ে নজরুলের বিদ্রোহ বিস্তারিত। তাঁর বিদ্রোহী সত্তার অন্তত তিনটি দিক থেকে আলোচনা যোগ্যঃ

১. আমিদের বিকাশ।

২. বোধীদীপ্ত দায়িত্ব বোধ থেকে জাত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিষয়ে অভিব্যক্তি।

৩. কাব্য-কলার গঠন-কৌশল ও বাক্ নির্মিতির স্বাভাব্যতা।

আমিদের বিকাশঃ একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তাঁর ব্যক্তিত্ব। ধন নয়, মান নয়-ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বহীন মানুষ যত বড় শিক্ষিত, বিদগ্ধ, পণ্ডিত, সম্পদশালী কিম্বা প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্নই হোন না কেন; মূলত তিনি দুর্বল ও মেরুমজ্জাহীন, নির্জীব, নিস্প্রাণ, অপূর্ণাঙ্গ মানুষ। নামকাওয়াস্তে মানব সত্তাময়। Unique Individuality মানব মহিমার ভূষণ। অনন্য ব্যক্তিসত্তা মানুষের অমূল্য সম্পদ।

## সাহিত্যিকী

১.১ নজরুল যে কালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেকালের ভারতবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অভাব ছিল ব্যক্তিত্বের – আত্মপরিচিতির। ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবেও এদেশের মানুষ ছিল নৃজপৃষ্ঠ – দুর্বল ব্যক্তিত্বের। স্থানে-অস্থানে নতজানু প্রবণতা এদেশের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার গভীরে এই ব্যক্তিত্বহীনতার বীজ অঙ্কুরিত। এদেশে তথাকথিত ধর্মানুভূতি, প্রথাসিদ্ধতা ও সংস্কারাঙ্কনতার ব্যাপকতার কথা সর্বজনবিদিত। দরগা, খানকাহ, মাজার, পীর, পুরোহিত, সাঁই, গোসাঁই, ফকির দরবেশ, গণকঠাকুর, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানা, ডাইনী প্রভৃতি হামবক-বুজরুকদের আলৌকিক ক্ষমতার প্রতি অগাধ বিশ্বাসের ফলে এদের প্রতি সশ্রদ্ধ সেজদা, প্রণিপাত, কৃপা ভিক্ষা, প্রার্থনা, নৈবেদ্য এদেশের মানুষের দীর্ঘকালের অভ্যাসগত ব্যাপার; পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় মননের অঙ্গিভূত বিষয়। এ বিষয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পণ্ডিত-মূর্খের ইতরবিশেষ নেই প্রায়। উঠতে, বসতে, হাঁচতে কাশতে, শ্রদ্ধ-স্বস্ত্যয়ণে, আকিকায়, নামকরণে, ব্যবসা, বাণিজ্যে, বিবাহ-শুভদিনে, যাত্রায় কিম্বা গৃহানুগমণে যারা নিত্য দিন হাজারো অপশক্তির নিকট ক্রমাগত মাথা ঠোকে, তাদের ব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠতা এবং আত্ম বিশ্বাসে স্বকীয়তা প্রত্যাশা করা যায় না। এ সমস্ত অপশক্তি ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সে সময় যে জাতিগত অহংবোধ ও বিশ্বাসের শুদ্ধতার তীব্র প্রয়োজন ছিল, নজরুল তার প্রতিভা হতে পেরেছিলেন প্রায় সর্বতোভাবেই। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায়,

“ভীরুতা ছিল যে সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য সেখানে তিনি শক্তির সাধনা করেছিলেন। স্বার্থচেতনা ছিল যে মানসিকতার প্রধান লক্ষণ তাকে তিনি বৃহত্তর মধ্যে নিজেকে ব্যাণ্ড করার প্রেরণায় উদ্বীণ করেছিলেন। কৃষ্টি-যেখানে বৈশিষ্ট্যহীন গতানুগতিকতায় নিজের সার্থকতা খুঁজত, সেখানে স্পর্ধিত ব্যক্তিত্বের দুর্জয় ঘোষণা তিনি জ্ঞানিয়ে ছিলেন। উপকথার কদাকার দৈত্যের মত-অত্যাচারী ক্ষমতার যে বোঝা উপমহাদেশের নিরীহ প্রাণকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠকে তিনি স্বরগ্রামের শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের পক্ষে তাঁর যে সমর্থন তা-ও প্রচন্ড।”<sup>৪</sup>

“যে বছর তিনি বাঙালী পল্টনে যোগদেন, সে বছর রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। আর যে বছর তিনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন সেবছর প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। পঁচিশ বছর ধরে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। আর সেই কাল কী অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, দুরন্ত! ১৯১৯-এ রাউ লাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলল, ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পর বছর হল খেলাফত

## বিদ্রোহীঃ আমিত্বের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

আন্দোলন, তারপর এল অসহযোগের প্রাবন, হযরত মোহানী দাবী করলেন সারা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। বড় লাট তার করলেন ভারত-সচিবকে-মুসলিমজনশক্তির একটা বড় অংশ ক্ষুদ্র ও উত্তেজিত। স্বরাজ পার্টি, সাইমন কমিশন, নেহেরু রিপোর্ট, ১৯২৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, '২৮ সালে ভারতের বৃহত্তম শ্রমিক ধর্মঘট। '২৯-এ কংগ্রেস চাইল পূর্ণ স্বরাজ, ৩০-এ গোল টেবিল বৈঠক, চট্টগ্রাম অত্রাগার লুণ্ঠন। তারপর আইন অমান্য আন্দোলন, মুসলিম কনফারেন্স, কংগ্রেসে ভাঙ্গন, '৩৮-এ দেশব্যাপী কৃষাগ আন্দোলন, ৪০-এ লাহোর প্রস্তাব। এই ঝঞ্ঝাবিস্কুল কালপ্রবাহের উৎস-সলিলে নজরুল অবগাহন করেছিলেন। তাই কালের চেতনা তাঁর মধ্যে তীব্রভাবে স্পন্দিত হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনমানসের বিক্ষোভ ও অসন্তি কাব্যে রূপায়িত হয়েছে; আমাদের দেশে এই কাজ সাধন করেছিলেন নজরুল ইসলাম। যুদ্ধোত্তর সংকটের পরিচয়ে ত্রিযমান না হয়ে তিনি কর্মোদ্যম প্রকাশ করেছেন, নিরুদ্যম নির্জীব-বাস্তবালীকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন, পরাধীনতার তীব্রজ্বালা অনুভব করেই ক্ষান্ত হননি-শৃঙ্খল মোচনের জন্যে সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে দেশবাসীকে একত্রিত হতে বলেছেন, রুশ বিপ্লবের প্রেরণায় উল্লসিত হয়ে স্বপ্ন দেখেছেন এক নতুন পৃথিবীর – যেখানে পররাজ্য গ্রাসের লিপ্সা নেই, পরশ্রমজীবীর স্থান নেই।<sup>১৫</sup>

১.৩ নজরুলের ব্যক্তিসত্তা, কাব্যচর্চা ও বিদ্রোহের মূল রহস্য এখানেই। নজরুল প্রতিভা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিষয়টা জরুরি। মানব মহিমা কত বিপুল ও ব্যাপক প্রসারী হতে পারে তার উজ্জ্বল পরিচয় 'বিদ্রোহী'। পৌরাণিক চরিত্র বিদ্রোহী ভৃগুর মত নজরুল ভগবান বৃকে পদচিহ্ন ঐকে দেয়ার অহংকার ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু'। ভগবার বৃকে ঐকে দিব পদচিহ্ন।<sup>১৬</sup> ধীরোদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন 'ঋদার আসন আরশ ছেদিয়া/উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতীর।'<sup>১৭</sup> তাঁর সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্বের স্পর্শে হাবিয়া দোজখ 'নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।'<sup>১৮</sup> 'ক্ষ্যাপা দুর্বাসা বিশ্বামিত্র শিষ্য'<sup>১৯</sup> তিনি। তিনি 'ইন্দ্রানী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য'।<sup>২০</sup> মহাপ্রলয়ের নটরাজের মত সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দেয়া তাঁর স্বভাব। কিন্তু তাও কল্যাণ অর্থেরই। 'ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর'।<sup>২১</sup> তিনি দলে যান'যত বন্ধন, নিয়ম কানুন শৃঙ্খল'।<sup>২২</sup>

কারণ তিনি আপনারে ছাড়া করেন না 'কাহারে কুর্গিশ'।<sup>২৩</sup> তাঁর আত্মসত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে যত বাঁধাই আসুক, তা তিনি মাড়িয়ে যাবেন-ই। তাঁর চির উন্নত মগ্ন চৈতন্য সदा জাগ্রত। 'নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির'।<sup>২৪</sup> তিনি যুগে যুগে আসেন, আসিয়াছেন' পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু'।<sup>২৫</sup> বিধি ও নিয়মে লাগি মেরে, ঠুঁকি বিধাতার বৃকে হাতুড়ি' 'স্রষ্টার ফাঁকি ও 'সৃষ্টির চাতুরী' <sup>২৬</sup> উদ্ধার করবেন তিনি। 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' মুখ হাসে তাঁর চোখ হাসে তাঁর টগবগিয়ে খুন হাসে।<sup>২৭</sup>

## সাহিত্যিকী

এভাবে নিজের আত্মোৎবোধনের তুর্য্য নিনাদ বাজিয়ে নজরুল মূলত আত্ম অসচেতন নিজীব দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ঘুম ভাঙাতে চেয়েছেন পরাধীন ভারতবাসীর। ভাঙতে চেয়েছেন সকল প্রকার সংস্কারের শৃঙ্খল, ধর্মান্ধতার বেড়ি, সাম্প্রদায়িকতার উৎকট মোহ। তাঁর পরস্পর বিরোধী সকল প্রকার আত্মউল্লাস আসলে, এক অপরিমেয় শক্তিশালী আত্মোদ্বোধনীমন্ত্র।

১. 'সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,  
নেই কিরে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?  
শিকল গুলো বিকল ক'রে পায়ের তলায় মাড়ায়,  
বস্ত্রহাতে জিন্দানের এ ভিত্তিটাকে নাড়ায়?  
নাজাত পথের আজাদ মানব নেই কিরে কেউ বাঁচা  
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেঘের খাঁচা।"১৭
২. "এস বিদ্রোহী তরুণ তাপস আত্মশক্তি-বুদ্ধ-বীর,  
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ বিজলী ঝলক ন্যায়-অসির।"১৮

নজরুলের এই চকিত আত্ম উপলব্ধির বাজ্য প্রকাশ দেখে সেদিনের যুব সমাজ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। নজরুলের মত তাদেরও 'রুদ্র-প্রাণের পন্থে'১৯ 'বাণ ডাকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার ভাঙা কল্লোলে'।২০ এসব বক্তব্যে ভারতীয় যুবমানসের আত্মজাগৃতির সম্ভাবনার শঙ্কায় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী পর্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর বক্তব্য-অভিভাষণ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস আর আশুন ঝরা প্রবন্ধাবলী বৃটিশ স্বার্থের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হ'ল। চালচুলোহীন নিঃস্ব নজরুলের আত্মোদ্বোধনী ব্যক্তিত্ব দেখে কম্পিত হলেন ইংরেজ সরকার। বুঝতে পারলেন 'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন খুলিতে হবে।'২১ শত শত ধনকুবের নয়, শত কোটি জনতাও নয়, নজরুল একাই একশ'। সে দেশের মধ্যে একজন নয়, সে হচ্ছে যাকে বলে এগারো। অতএব তাঁকে সামলানো জরুরি।

দেশবাসীকে তাঁর ভয়ঙ্কর সম্মোহনী শক্তি ও অশুভ সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে না পারলে ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের পক্ষে নিরোপদ্রুপে রাজ্যশাসন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অতএব অনতিবিলম্বে তাঁর কথচ্ছল কথকথা আর স্পর্ধিত বাণীবন্দনার মুখে এঁটে দিতে নিচ্ছিদ্র কুলুপ। অগ্নিস্রাবী কাব্যকলা আর আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত লাভার মত টগবগে উত্তেজনাময় প্রবন্ধ রচনার উপর আরোপ করতে হবে সরকারী দণ্ডদেশ – রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা।

১.৪ সঙ্গত কারণেই এরপর নজরুলের উপর শুরু হল বৃটিশ সরকারের শাসন-তাসন-নির্যাতন। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে (কার্তিক, ১৩২৯) নজরুলের প্রথম কাব্য

১৬৬

### বিদ্রোহীঃ আমিত্বের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

গ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’ এবং প্রবন্ধ গ্রন্থ ‘যুগবাণী’ প্রকাশিত হলে রাজদ্রোহের অপরাধে ‘যুগবাণী’ বেআইনী ঘোষিত ও বাজেয়াফ্ হই। ৮ই নভেম্বর ১৯২২-এ বাজেয়াফ্ হই ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ ও ‘বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ’ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের Indian penal code -এর ১২৪ ধারা অনুসারে ধূমকেতু অফিস খানাতল্লাসী ও সম্পাদক নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। নজরুল সে সময় সমষ্টিপুরে থাকায় গ্রেফতার থেকে তখন রক্ষা পান বটে কিন্তু ২৩শে নভেম্বর সমষ্টিপুর ঘুরে কুমিল্লা এসে পৌছানো মাত্রই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। রাজদ্রোহীতার মামলা চলতে থাকে কবির বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ এবং ‘যুগবাণীর’ একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠককে জানানো প্রয়োজন মনে করি।

‘আনন্দময়ীর আগমনে’র বাজেয়াফ্ ও নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার কারণ সম্পর্কে কমরেড মুজফফর আহমদ ‘কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথায়’ মন্তব্য করেছেন, “ধূমকেতুর অনেক লেখা নিয়েই নজরুলের নামে মোকদ্দমা হতে পারত, কিন্তু মোকদ্দমা হল ‘আনন্দময়ীর আগমনে’-কে নিয়ে। এই কবিতাটি লেখার ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে। ‘দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা’ সে বছর প্রথম বার হয়েছিল। শ্রী সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, শ্রী প্রফুল্ল সরকার ও শ্রী মৃণালকান্তি ঘোষ (অমৃত বাজার পত্রিকার শিশির কুমার ঘোষের ভ্রাতৃপুত্র) ছিলেন এই পত্রিকার মালিক। মৃণাল বাবু নজরুলকে ভালোবাসতেন। নজরুল তাঁর মারফতে একটা বিজ্ঞাপন বা অন্যকিছু, মনে হয় বিজ্ঞাপনই, পেতে চিয়েছিলেন। মৃণাল বাবু তা পাইয়ে দিতে স্বীকার করে বলেছিলেন যে, “তার আগে তুমি ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র পূজা সংখ্যার জন্যে একটি আগমনী কবিতা লিখে দাও।” নজরুল তাই লিখেছিল ‘আনন্দময়ীর আগমনে।’”২২

কবিতাটি সরকারে বাজিয়াফ্ হয়ে যাওয়ায় নজরুলের কোন পুস্তকে তা ছাপা হতে পারেনি।” সে যা হোক, আমরা ‘কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা’ গ্রন্থ থেকে কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

আর কতকাল থাকবি বেটি ঢেলার মূর্তি আড়াল?  
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।  
দেব শিবদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,  
ভূতরত আঁজ কষাই খানা, আসবি কখন সর্বনাসী?  
শান্তি কোথায় শান্তি কোথায় কেউ জানিনা  
মাগো তোর দনুজ-দলন সংহারিনী মূর্তি বিনা!

## সাহিত্যিকী

পুরুষ গুলোর ঝুটি ধরে বুরুশ করায় দানব ভুতো,  
মুখে ভজে আচ্ছা-হরি, পূজে কিছু ডান্ডা-গুতো।  
দাড়ি নাড়ে ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নামাজ পড়ে,  
নাইকো খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এসব বন্দী গড়ে।  
'লানত' গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুম বাজে  
ধর্ম-ধ্বজা উড়ায় দাড়ি, গলিজ মুখে কোরান ভাঁজে  
তাজ হারা যার নাসা শিরে গরমা গরম পড়ছে জুতি  
ধর্ম কথা বলছে তারাই পড়ছে তারাই কেতাব পুঁথি।  
মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহি'ংসা বোল নাকি নাকি  
খড়ায় কেটে করমা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।  
হান্ তরবার, আনমা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,  
মাদীগুলোয় করমা পুরুষ রক্ত দেমা রক্ত দেখা'! ২৩

লক্ষ করা যাবে কবিতাটিতে এক দিকে ভীরা মানুষ নামের মেঘশাবকদের তীব্র  
ধিক্কারে জর্জরিত করা হয়েছে, অন্য দিকে জাতিকো পৌরুষত্বে মগ্নিত করার জন্য  
আনন্দময়ীর নিকট যৌক্তিক আবেদন পেশ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিদেশী  
শাসকগোষ্ঠীর ঘন্যতম নাগপাশ ছিন্ন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর বিপুল স্পৃহা এবং শক্তি  
অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। বৃটিশ শাসককুলের ভয়ের কারণ এখানেই। অনুরূপভাবে  
'যুগবাণী'র বিভিন্ন প্রবন্ধে জ্বালা ধরানো উত্তেজনা পরিবেশিত হয়েছে জাতির উদ্দেশ্যে।  
বিশেষ করে 'নব্যযুগ', 'গৈছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ', 'ধর্ম-ঘট', 'মহাজিরিন  
হত্যার জন্য দায়ী কে', 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন', 'মুখবন্ধ', 'সত্যশিক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধের  
মর্মার্থ জাতিকো বীর্যবন্ত, অহংদুগু ও নির্ভীক করে তোলার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী অবদানে  
উজ্জ্বল।

### ১.৫ 'নব্যযুগ' প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে এভাবেঃ

আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহাআনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের  
মহাউদ্বোধন। আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার  
অপূর্ব-মুক্তি-কাভাল বেশ। ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনঝকার। তাহারা  
শৃঙ্খল মুক্ত হইবে, তাহারা কারা গৃহ ভাঙিবে। ঐ শোনো মুক্তি পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের  
মুক্তিবিষাণ। ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর গুণশঙ্খ। ঐ শোনো ইসরাফিলের শিঁজায় নব সৃষ্টির  
উল্লাস-ঘন রোল। ঐ যে ভীম রণকোলাহল, তাহাতেই মুক্তিকামী দৃগু তরুণের শিকল টুটার শব্দ  
ঝনঝন করিয়া বাজিতেছে। সাগ্নিক ঋষির ঋক্‌মন্ত্র আজ বাণী লাভ করিয়াছে অগ্নিপাথারের অগ্নি

## বিদ্রোহীঃ আমিত্বের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

কল্লোল। আজ নিখিল উৎসীড়িতের প্রাণ শিখা জুলিয়া উঠিয়াছে ঐ মন্ত্র শিখার পরশ পাইয়া। আজ তাহারা অন্ধ নয়, তাহাদের চোখের উপরকার কৃষ্ণপর্দা তীব্র বহিখাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নয়নে আজ মুক্তজ্যোতি বিস্ফারিত। আজ নুতন করিয়া মহাগগন তলে দাঁড়াইয়া ঐ অনাদী অসীম মুক্ত শূন্যতার পানে তাহারা চাহিয়া দেখিয়াছে, কোথায় সে অনন্ত মুক্তি, আর কোথায় তাহারা পড়িয়া আছে বন্ধন জর্জরিত। নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব। তাঁহার হাতে স্বাধীনতার বাঁশি।”<sup>২৪</sup>

এসব কথা কোন্ স্বৈরাচারী সরকারের ভালো লাগবে? কোন আত্মসন্যাসী শক্তি ভীত হবেনা এমনতর অমিয় বাণী ধারার বিপুল বর্ষণে? পররাজ্য লোলুপ কোন অপশক্তিরই বা গাত্রদাহ শুরু হবে না এসব তীর্যক উক্তির ক্ষুরধার তেজস্ক্রিয়তায়? বৃটিশ স্বার্থ বিরোধী অনুরূপ উক্তি আরো প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ ভাষায় স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে, ‘গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ’ প্রবন্ধে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারলে যে হত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার কোন ব্যাপারই নয়, তা প্রাবন্ধিকের বিশ্লষণী দৃষ্টিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ প্রবন্ধে শক্তি মদমত্ত রোম সাম্রাজ্য ও জার্মানীর মত মহাশক্তির পরাজয় প্রসঙ্গত পাঠককে স্মরণ করে দেয়া হয়েছে। বিবেকের অসীম ক্ষমতার কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, ‘মনুষ্যত্বহীন আত্ম সম্মান শূন্য কাপুরুষের মত’ বাঁচায়ে মানবমহিমার জন্য চরম লজ্জাজনক ব্যাপার, সে বিষয় লেখকের নিঃসংশয় দ্ব্যর্থহীন উক্তি উচ্চকিত। তাঁর ভাষায়ঃ

তুমি কি চাও? কুকুর-বিড়ালের মতো ঘন্যমরা মরিতে, না মানুষের মতো মরিয়া অমর হইতে?  
তুমি কি চাও? শৃঙ্খল, না স্বাধীনতা? তুমি কি চাও? তোমাকে লোকে মানুষের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করুক, না, পা-চাটা কুকুরের মতো মুখে লাথি মারুক?”<sup>২৫</sup>

‘গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ’- কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রাতঃ স্মরণীয় উক্তি। এ উক্তিকে কেন্দ্র করেই প্রবন্ধের মূলভাব আবর্তিত। বিশ্লেষিত কবি মনের গভীর ক্ষত, ক্ষোভ, দুঃখ ও আশাবাদ।

“স্বাধীনতা হারাইয়া যখন আত্মশক্তিতে অবিস্বাসী হইয়া পড়িলাম এবং আকাশ মুখো হইয়া কোন অজানা পাশাণ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলই কান্না জুড়িয়া দিলাম, তখন কবির কণ্ঠে আশার বাণী দৈব-বাণীর মতোই দিকে দিকে বিঘোষিত হইল, “গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ’! বাস্তবিকই আজ আমরা অধীন হইয়াছি বলিয়া চিরকালই যে অধীন হইয়া থাকিব, এরূপ কোন কথা নাই। কাহাকেও কেহ কখনো চিরদিন অধীন করিয়া রাখিতে পারে নাই, কারণ ইহা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কেহ কখনো জয়ী হইতে পারে না, আজ যাহারা স্বাধীন হইয়া নিজের অধীনতার কথা জুলিয়া অন্যকেও আবার অধীনতার জাঁতায় পিষ্ট করিতেছে, কে জানে প্রকৃতি তাহাদের এই অপরাধের পরিণাম কত নির্মম হইয়া লিখিয়া রাখিয়াছে!”<sup>২৬</sup>

## সাহিত্যিকী

‘মহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে’ প্রবন্ধের বক্তব্য আরো ঝজু, বলিষ্ঠ। জনৈক মহাজিরিন ‘হতভাগ্য হাবিবুল্লাহ হত্যা-বিভৎসতা-র প্রতিবাদে প্রবন্ধটি রচিত। ‘একদল ভারতীয় সৈন্য তিন তিন বার গুলি করে, তাতে মাত্র একজন নিহত হয় ও একজন আহত হয়।’ এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধকারের মন্তব্য “কোন মূর্খ বিশ্বাস করিবে এ কথা?” ২৭

“কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, তোমাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোক খুন কর, আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠাকাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পারিব না।? মনুষ্যত্বের বিবেকের, আত্মসম্মানের, স্বাধীনতার উপর এত জুলুম কেহ কখনো সহ্য করিতে পারে কি?” ২৮

ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়ন কর্মসূচীর অন্তর্গত মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের একটি চমৎকার হৃদয় গ্রাহী বিশ্লেষণ ‘যুগবাণী’র “মুখবন্ধ” প্রবন্ধটি। “খুব সোজা করিয়া বলিতে গেলে নন-কো-অপারেশন হইতেছে বিছুটি বা আলকুসী, এবং আমলাতন্ত্র হইতেছেন ছাগল। ছাগলের গায়ে বিছুটি লাগিলে যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে, এই আমলাতন্ত্রও তেমন অসহযোগিতা-বিছুটির জ্বালায় বে-সামাল হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিছুতেই যখন জ্বলন ঠাণ্ডা হয় না, তখন ছাগবেচারী জলে গিয়া লাফাইয়া পড়ে, দেওয়ালে গা ঘষিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্বালা না কমিয়া আরো বাড়িতেই থাকে, উল্টো ঘষাঘষির চোটে তাহার চামড়াটি দিব্যি ক্ষৌরকর্ম করার মতই লোমশূন্য হইয়া যায়। আমলাতন্ত্রের গায়েও বিছুটি লাগিয়াছে এবং তাই তিনি কখনো জলে নামিতেছেন, কখনো ডাঙায় ছুটিতেছেন, আর কখনো বা দেওয়ালে গা ঘেসড়াইয়া খামখা নিজেরই নুনছাল তুলিতেছে। তবু কিন্তু জ্বলন আর থামিতেছে না, বরং ক্রমেই বাড়িতেছে। এখন এই আমলাতন্ত্রের ল্যাজের ডগা হইতে মাথার চুল পর্যন্ত সমস্ত কিছুই এত অস্বাভাবিক রকমের বিপর্যস্ত হইয়া গিয়েছে যে, তাহা দেখিলেও হাসি পায়, কান্নাও আসে। ইহা যেন বহরমপুর বা কসৌলি প্রেরণের পূর্ব লক্ষণ। একটা গান আছে, “ও যার কপালে আগুন ধরে, তার নাইক কোথাও সুখ, .....।” বাস্তবিক এখন এই রাজতন্ত্র উর্ধ্বে আমলাতন্ত্র মশাই-এর “অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।” ২৯

✓ ১.৬ ‘যুগবাণী’র বিভিন্ন প্রবন্ধে নজরুলের জাগ্রত, প্রাণসর, প্রাসঙ্গিক ও বৃষ্টিশ বিরোধী যে পরোক্ষ উক্তি সমূহ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের মোকদ্দমা ঠুকে

## বিদ্রোহীঃ আমিত্বের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

দেয়ার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। মূলত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বাধীনতার স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য এবং পরাধীনতার গ্লানীকর বিষয়ে উচ্চকিত বিমোদগারে হতচকিত ও অনন্যোপায় ইংরেজ সরকার আনন্দময়ীর আগমনে'-অছিলা করে নজরুলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে বিচার প্রার্থী হয়।

১৯২৩ সালে ১৬ই জানুয়ারী ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো সাহেব মামলার রায় ঘোষণা করেন; ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারা অনুসারে নজরুল এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই মামলায় নজরুল আত্মসমর্থন করে আদালতে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'রাজবন্দীর জবাববন্দী' পাঠ করেন। বাগবৈদগন্ধ ও যুক্তির নৈপুণ্য প্রবন্ধটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নির্ভীক আত্মকথন, দ্বিধাহীন পৌরুষত্ব ও সুতীব্র অহংবোধে 'রাজবন্দীর জবাববন্দী' অনন্য। বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম কারা সাহিত্য। 'রাজবন্দীর জবাববন্দী'র খানিকটা প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করা নজরুল মানসের স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্যই জরুরি মনে করিঃ

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। এক ধারে রাজার মুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। ✓

একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড, আর জন সত্য, হাতে ন্যায় দণ্ড। রাজার পক্ষে- নিযুক্ত রাজবেতন ভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে- সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্যজ্যোত উগবান।

আমার বিচারক কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। ঐর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ডিয়ারীর এক তারা পাশাপাশি স্থান পায়। ঐর আইন- ন্যায়, ধর্ম। সে আইন কোন বিজেতা মানব কোন বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরী করে নাই। সে আইন- বিশ্ব-মানবের সত্য উপলব্ধি হতে সৃষ্টি, সে আইন- সার্বজনীন সত্যের, সে আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে- পরমাণু পরিমাণ ষড় সৃষ্টি, আমার পক্ষে আদি অন্তহীন অবন্ত স্রষ্টা।

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে- রূপ। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ, আমার পক্ষে যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য; লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বৃদবৃদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়াদেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজ বিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে সে বাণী ন্যায়, দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দ্বারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অলান, অনির্বাণ সত্য-স্বরূপ।

## সাহিত্যিকী

সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত আঁখি-রাজদন্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি তাই চিরন্তন স্বয়ং প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চির সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভাগবানকে ভাঙবে কে? একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছে- চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণী রুদ্র করেছে- সত্যের বাণীকে মৃ'ক করতে চাচ্ছে, সেও তারই এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টি অণু। তাঁর ইঙ্গিত আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে, কাল হয়ত থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের আর অন্ত নাই; সে যাহার সৃষ্টি, তাহাকেই সে আজ বন্দী করতে চায়, শান্তি দিতে চায়। কিন্তু অহঙ্কার একদিন চোখের জলে ডুববেই ডুববে।”<sup>৩০</sup>

৷ জৈনিক ইংরেজ সমালোচকের ভাষায়, কবি হচ্ছেন at the most conscious point of his age<sup>৩১</sup> “অগ্নিবীণার” ‘বিদ্রোহী’, ‘যুগবাণী’র বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং রাজবন্দীর জবানবন্দী’র সমষ্টি উপলব্ধি করে নজরুলের কবি মানস সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। জাগ্রত বিবেক ও যুগ চৈতন্যের উজ্জ্বল প্রতিভা তিনি। কালের তাগিদ, কালের প্রয়োজন ও কালের বিবেক তাঁর কণ্ঠে গাঢ়বদ্ধ বাণীরূপ লাভ করেছে। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান ‘নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার পটভূমি’ প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেনঃ

বহুকাল ধরে বাঙ্গালী মনের যে কথাটি ছিল অব্যক্ত, বাংলা কাব্যের মধ্যে যে ভাব বাণীলাভের কামনায় ছিল ব্যাকুল, যার আভাস ছিল চাঁদ সদাগর চরিত্রে, ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যে, বলাকা কাব্যের মধ্যে- সবার উর্দ্ধে আত্ম শক্তিকে বড় করে দেখার যে দুর্জয় প্রেরণা, তাই যেন মুখরিত হ’ল নজরুলের দীপ্ত কণ্ঠেঃ

কল বীর-

বল উন্নত মম শির।

শির নেহারি ‘আমারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির’।<sup>৩২</sup>

‘কালের পুতুল’ গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যও প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়। “বিদ্রোহী’ পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে- মনে হ’লো, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তাই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।”<sup>৩৩</sup>

নজরুল-কে “বাইরে থেকে ..... বোহেমিয়ান এবং রোমান্টিক মনে হলেও জীবনের গভীরতর সত্যে তিনি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন -- তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সে যুগের জাতীয় মানসকে অভিভূত করা।”<sup>৩৪</sup> অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঠিকই বলেছেনঃ

## বিদ্রোহীঃ আমিভূতের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

নজরুল বিমের বাঁশী বাজাচ্ছে, আর সে সুর সে কথা সবারই রক্তে বিদ্রোহের দাহ সঞ্চার করছে।  
--- প্রখরতার মধ্যে সে যে কি প্রবলতা, কার সাধ্য তা প্রতিরোধ করে। কার সাধ্য সে অগ্নিমন্ত্রে না  
দীক্ষা নেয় মনে মনে।” ৩৫

প্রকৃত পক্ষে নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে যৌবনের  
অভিষেক; পৌরুষত্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এ কারণেই সর্ব্বয় ভট্টাচার্য মনে করেন “নজরুলের  
সাহচর্য ছাড়া সেদিন মুক্ত যৌবন তার ভাষা খুঁজে পায়নি”। ৩৬

মনে রাখতে হবে, নজরুলের বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী ও বক্তব্যের ঝজুঝছ আলোক  
সম্পাত কৌশল তাঁর গভীর ব্যক্তিত্ববাদ ও ঘুম ভাঙানিয়া অগ্নিমন্ত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।  
তাঁর বিত্তহীন চিন্তের আকাশ স্পর্শী ব্যাপ্তি এবং স্পর্ধিত অহংবোধের একটি ঐতিহাসিক  
ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ। আমরা বর্ণনাটির ইংরেজী ভার্সন উদ্ধৃত করছি  
ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর Introducing Kazi Nazrul Islam গ্রন্থ থেকেঃ

About twenty years ago some notable Khan Bahadurs (Persons given decorations by the Government) of Dacca arranged a meeting with Nazrul Islam on a house-boat on the river Buriganga. The Khan Bahadurs gathered there in due time, but the poet was conspicuous by his absence. He was found, after a good deal of search, to be spending his time in the company of a friend-his boisterous laughter must have divulged his whereabouts. When he was reminded in a tone of subdued complaint that the revered Khan Bahadurs had been waiting for him for a long time, he said, ‘I am the poet of the land -- What else have the Khan Bahadurs to do expect wait for me patiently? The Khan Bahadurs and Rai Bahadurs of the land will line the street I shall pass through, will bow to me while I preceed accepting their Salaams (salutes) -- This is what may be ealled the true relationship between us’ ৩৭

১.৭ বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবদান, সাহিত্যের চারিত্রগত পরিবর্তনে তাঁর  
ক্ষুরধার লেখনীর প্রভাব, যুগ মানসের স্বরূপ উদ্ঘাটনে তাঁর আত্মগত অকৃত্রিম প্রয়াস, ললিত  
বানীভঙ্গীর পরিবর্তে পৌরুষ দীপ্ত উচ্চারণ, মাটির কাছাকাছি মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি-  
কান্না, আনন্দ-বেদনা, অভিমান-ক্ষোভ এবং তাদের স্বাধীকার বোধের কাব্যিক প্রকাশ, মানুষ

## সাহিত্যিকী

হিসেবে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, তাঁদের আত্মসম্মান বোধ, দেশপ্রেম, স্বাদেশীকতা, নারীর মর্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যক্ত নজরুলের চিন্তা-চেতনা বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। যোগ করেছে তাতে নতুন মাত্রা। এনেছে বৈচিত্র্য। পৌরুষত্ব। এ সবই স্বীকৃত সত্য। এ সত্যের প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে নির্দিধায়। কেউ কেউ মনে করেন, 'যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির লাগি কান পেতে আছি'-৩৮ রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি নজরুলকে উদ্দেশ্য করেই। তাছাড়া তদন্তিন মুসলমানদের মধ্যে নজরুলই একমাত্র ব্যক্তি যাকে একটি গ্রন্থ ('বসন্ত' গীতি নাটিকা) উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। শুধু তাই নয়, নজরুল সম্পাদিত 'ধূমকেতু' ও 'লাঙল' পত্রিকার জন্য লিখে দিয়ে ছিলেন আশীর্বচন।

১. কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,

আধারে বাধ অগ্নি সেতু,

দুর্দিনের ঐ দুর্গ শিরে

উড়িয়ে দে তোর বিজয়, কেতন!

অলক্ষণের তিলক রেখা,

রাভের ভালে হোক না লেখা,

জাগিয়ে দেয় চমক মেরে

আছে যারা অর্ধচেতন।<sup>৩৯</sup>

২৪ শ্রাবণ ১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. ভাগো, ভাগো, বলরাম, ধরো তব মরু ভাঙ্গা হল

প্রাণ দাও, শক্তি দাও, তরু করো ব্যর্থ কোলাহল।<sup>৪০</sup>

কিন্তু কেন নজরুলের মত চাল চুলোহীন, অর্ধ শিক্ষিত, বোহেমিয়ান একজন কবির জন্য রবীন্দ্রনাথের এত স্নেহাধিক্য? কেনইবা তাঁর প্রতি অপারিসীম দুর্বলতা? কারণ ঐ একটিই, নজরুলের নির্ভীক অনন্য ব্যক্তিত্ব, অনমনীয় আত্মপ্রত্যয়, দুর্জয় অহংবোধ আর বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনস্বীকার্য অবদান। 'ধূমকেতু' এবং 'লাঙলের' আশীর্বচন দুটির ব্যঞ্জনাগত তাৎপর্য ও অর্থদ্যোতকতা উপলব্ধি করতে পারলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অনুধাবন করা যাবে নজরুলের চারিত্র শক্তি, কর্মোদ্দীপনা, শ্রেয়োবোধ, আত্মবিশ্বাস এবং দেশ' হিতৈষণার প্রতি বিশ্ব কবির আস্থার গভীরতা।

## বিদ্রোহীঃ আমিভূতের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

রবীন্দ্রনাথের সাথে নজরুলের প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটিও নজরুল চরিত্রের বিস্ময়কর দুঃসাহসিকতাই প্রোজ্জ্বল করে তোলে।<sup>৮১</sup> রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে যেখানে বাঘা বাঘা ব্যক্তিত্ব আর খ্যাতিমান বিদগ্ধ পন্ডিতেরাও দ্বিধাশূন্য হয়ে পড়তেন, নজরুল সেখানে উপস্থিত হন সোল্লাসে 'দে গরুর গা ধুয়ে গাইতে গাইতে' এবং 'কবি গুরু তোমাকে আমি হত্যা করব' ইত্যাকার সর্দভ উক্তি অকম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করতে করতে। এথেকে নজরুল চরিত্রের দাঢ্যতা বিষয়ে সম্যক পরিচয় মেলে; পরিচয় মেলে জেলখানার কয়েদী জীবনে পরমানন্দে গেয়ে ওঠা 'এই শিকল পরা ছিল মোদের এই শিকল পরা ছিল, এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবরে বিকল'-<sup>৮১</sup> প্রভৃতি গানে এবং হুগলী ও বহরমপুর জেলখানায় নজরুল সহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ কয়েদী পর্যায়ে নামিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে নজরুলের ৩৯ দিনের লাগাতার অনশন ধর্মঘট পালনের ঐতিহাসিক ঘটনায়।

এবং এতে নজরুলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মানস দুর্বলতা ও মমত্ববোধের আরও একটি উচ্চগ্রাম পরিচয় পাওয়া যায় এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর উপযোগিতার গুরুত্ব অনুভব হয়ে ওঠে কবিগুরু কর্তৃক অনশন ব্রত ভঙ্গ করার অনুরোধ জ্ঞাপক টেলিগ্রামের ভাষায় 'Give up hunger strike, our literature claims you',<sup>৮২</sup>

৮১. ১.৮ 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে'-<sup>৮২</sup> এই ছিল নজরুলের জীবন দর্শনের মূল কথা। তিনি উচ্চকিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'যে যায়, যাক সে। আমি আছি। আমি নতুন করে জগৎ সৃষ্টি করব। নতুন আলোর প্রাণস্পন্দনে সৃষ্টির আঙ্গিনা তুলব ভরে।' কথাটা মিথ্যা নয়। দেশ ও দেশের মঙ্গল কামনার ক্ষেত্রে তিনি কারুর জন্য অপেক্ষা করেননি। স্ব-সৃষ্ট পথে তিনি একা একা হেটে গেছেন বহুদূর। পালন করেছেন স্বপ্ন দ্রষ্টার ভূমিকা, স্রষ্টার দায়িত্ব। এভাবে তিনি নিজেকে ব্যাণ্ড করে দিয়েছেন নানা সম্ভাবনার দিগন্তে। এ দিক থেকে তিনি একক ও অনন্য। সম্ভব কারণেই ১৯২৯ সালে বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে কলকাতার এ্যালবার্ট হলে তাঁকে যে সম্বর্ধনা দেয়া হয়, তাতে সুভাষ চন্দ্র বসু বলেনঃ

আমরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাব তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই।----  
নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণ মাতানো গান শুনেছি বলে মনে হয়না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির।"<sup>৮৩</sup>

## সাহিত্যিকী

সত্যি, তাই। জাতিসত্তার প্রতিভূ ছিলেন বলেই সচেতন ব্যক্তি, ধীমান বুদ্ধিজীবী, প্রাজ্ঞ পণ্ডিত, আন্তর্জাতিকমানের কবি-সাহিত্যিক, প্রাণসর চিন্তার অধিকারী দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ও জগত জনতার প্রণত শ্রদ্ধা নজরুলের প্রতি।

২.০ বোধীদীপ্ত দায়িত্ব বোধ থেকে জাত আর্থ-সামাজিক- রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক বিষয়ে অভিব্যক্তিঃ

সমাজ সচেতনতা ও মানবপ্রেম নজরুলের কাব্য প্রেরণার অন্যতম অনুষঙ্গ। কাব্য চর্চার শুরু থেকে শেষ অবধি এ দু'টি বিষয়ের প্রতি নজরুলের বিশ্বস্ততা ছিল বিশ্বয়কর রকমের অবিচ্ছিন্ন। এমনকি, প্রাণপ্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর নজরুল যখন অধ্যাত্ম চিন্তার গভীরে নিমগ্ন হন, তখনও তিনি সমাজ মনস্কতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেননি।

নজরুল সুফী কবি ছিলেন না, ছিলেন সমাজ সচেতন, মানব কল্যাণমুখী, বাস্তববাদী কবি। তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্য সাধনার মধ্যে আপাত অধ্যাত্মমগ্নতা দৃষ্টিগোচর হলেও, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় উপান্তে সমাজভাবনা ও মানবতা বাদই তাঁর চেতনায় বড় হয়ে উঠেছে।

“প্রশ্ন উঠতে পারে কৈশোরে তাঁর মসজিদে ইমামতি, গ্রাম্য মন্ডবে শিক্ষকতা কিম্বা মাজারে খিদমত গায়ের ভূমিকায় নজরুলের ধর্ম ভাবনার। অথবা ১২/১৩ বছর বয়স্ক কিশোর নজরুল রচিত ‘চাষার গীত’ এবং ‘আকবর বাদশাহ’ পালা গানে ব্যক্ত তাঁর ভক্তিবাদী মনোভাবের কথা নিয়ে। প্রসঙ্গতঃ গান দু’টোর প্রয়োজনীয় অংশ এখানে যথাক্রমে উল্লেখ করছিঃ

ক. লা-ইলাহা ইল্লালাতে / বীজ ফেলা তুই বিধি মতে

পারি ঈমান ফসল তাতে/ আর রইবি সুখেতে।”

খ. সর্বপ্রথম বন্দনা গাই/ তোমারই ওগো বারী তা’ লা।”<sup>৪৪</sup>

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, নজরুলের ঐ সমস্ত কবিতা ছিল নিতান্তই ক্ষণিক প্রেরণা এবং দেহতত্ত্ব মূলক গানের অনুকরণে রচিত স্বল্পকালীন ব্যাপার। নজরুলের পরবর্তী সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এদের কোন সুদূর প্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তৎকালে নজরুলের বয়সের কথা হিসেবের মধ্যে আনলে পরিণত জীবনের উপর তার প্রভাব না পড়াটাই স্বাভাবিক বলে মনে হবে। ‘চাষার গীত’-এর ‘চাষ কর দেহ জমিনেতে/ হবে নানা ফসল এতে’-র পর নজরুলের উল্লেখযোগ্য দেহতাত্ত্বিক গান হচ্ছে একটি ‘নাতে রসুল’ “আহমদের ঐ মিমের পর্দা উঠিয়ে দেখ মন/ আহাদ সেথায় বিরাজ করে/ হেরে গুণীজন”

## বিদ্রোহীঃ আনিত্বের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

এবং ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলী উৎসবের সভাপতির ভাষণে উল্লেখ্যঃ

যার ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্যমধুর রূপ দর্শন করেছি'র মত কতিপয় উক্তি।

কিন্তু এসব উক্তিতে ভক্তিবাদের পরিচয় থাকলেও, এ গুলো তাঁর ধর্মানুভবের ক্রমবিকাশ বা আধ্যাত্ম চিন্তার চূড়ান্ত পরিচয় নয়। কেননা উল্লিখিত শেষোক্ত উক্তিটি নজরুল যে অভিভাষণে ব্যক্ত করেন, সেখানেও তিনি শেষ পর্যন্ত রুঢ় বাস্তবতার ভিত্তি ভূমির উপর পা রাখেন, উপনীত হন মানব কল্যাণের প্রীতিময় মোহনায় এবং স্পষ্ট করে বলেনঃ

হিন্দু-মুসলমানের দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে এক দিকে কঠোর দাখিলা, স্বর্ণ, অভাব-অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাশাপাশি তুপের মত জমা হয়ে আছে -- এই অসাম্য, এই ভেদ জ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম।” ৪৫

শুধু এই ভাষণের কথাইবা বলি কেন, তাঁর সব রচনারই মূল সুর মানবপ্রীতি, সমাজকল্যাণ; তা ‘রাস্তাজবা’, ‘দশমহাবিদ্যা’, ‘হর-প্রিয়া’, ‘দেবীস্তুতি’, ‘ইসলামী গান’, ‘গজল’, ‘হামদ’, ‘নাত’ কিম্বা মহাপুরুষ মুহম্মদ (সঃ) এর জীবন চরিত -- যাই হোক না কেন। মুক্ত চিন্তা, নিরপেক্ষ অখণ্ড দৃষ্টি এবং সামগ্রিক বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের পবিত্র দায়িত্ব পালন করলে এ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ প্রায় প্রশ্নাতীত।

২.১ পরাধীনতার বেদনা, স্বাধীনতা হীনতার লজ্জা, বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার, নিপীড়নের জ্বালা, অর্থনৈতিক শোষণের নির্মমতা, আত্ম-পরিচিতিহীন সাংস্কৃতিক পুণরাবৃত্তির ভয়াবহতা, এবং অন্ধসমাজ সংস্কার, ধর্মমত্ততা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সর্বগ্রাসী পরিণতি সম্পর্কে নজরুলের চেতনা ছিল প্রখর সূর্যালোকের মত প্রজ্জ্বল। চোখ বন্ধ করে প্রলয় এড়ানোর কৌশলে বা বিভ্রান্ত আত্মরতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং সচেতন প্রতিবাদে সর্বপ্রকার নৈরাজ্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর পৌরুষত্ব তাঁর ছিল। সঙ্গত ভাবেই তাঁর শ্রেয়োবোধ তাঁকে প্রতিবাদী করে তোলে। ‘অগ্নিবীণা’ (১৯২২) কাব্যের দ্বিতীয় কবিতা “বিদ্রোহী”-তে তিনি ঘোষণা করেন, “উপড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।” ৪৬ এই বৃহত্তর সংকল্পের বাস্তবায়ন উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারসহ সর্বপ্রকার অপশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহঃ

মহাবিদ্রোহী রণ ক্লাস্ত

আমি সেই দিন হব শান্ত,

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা।” ৪৭

## সাহিত্যিকী

অতএব “বিদ্রোহী”র পূর্বে “প্রলয়োদ্ভাস” কবিতায় ব্যক্ত “ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন বেদন!/ আসছে নবীন জীবন হারা অসুন্দরে করতে ছেদন”<sup>৪৮</sup> – কথা গুচ্ছের ব্যঞ্জনা’ ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বৈশাখীর ঝড়”<sup>৪৯</sup> -এই বৃহত্তর তাৎপর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে এবং স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় “বজ্রশিখার মশাল জ্বলে আসছে ভয়ঙ্কর;”<sup>৫০</sup> যার কল্যাণী শুভাগমনে জয়ধ্বনি করা যায়। সুতরাং

‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর  
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।’<sup>৫১</sup>

একই কারণে “রক্তাস্বরধারিনী মা”-তে নজরুল প্রত্যাশা করেছেন “জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে/ লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ”<sup>৫২</sup> এবং “আগমনী”-তে দেশবাসীকে উনিয়েছেন আশ্বাস বাণী-

মহা মাতা ঐ সিংহ বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে  
স্বাধীনত নহে দানব শক্তি, গায়ে পিষে যায় শির পত্তর।<sup>৫৩</sup>



“কামাল পাশা” কবিতার অভিব্যক্তনাও অভিন্ন তাৎপর্যে বিচার্য। “আজাদ মানুষবন্দী করে, অধীন করে স্বাধীন দেশ”<sup>৫৪</sup> যারা “জোর দেখালে ক’দিন বেশ,”<sup>৫৫</sup> কামাল পাশার সফল নেতৃত্বে পর্যুদস্ত ও পরাজিত সেই অপশক্তির বিরুদ্ধে কবির শ্লেষ উচ্চকিত বাণী বিন্যাসে উচ্চারিত এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতাকামী মানুষের পবিত্র আত্মোপলব্ধি নিম্নোক্ত ভাষায় অভিব্যক্তঃ

এই তো চাই! এই তো চাই  
থাকলে স্বাধীন সবাই আছি, নেইতো নাই, নেইতো নাই  
এই তো চাই।<sup>৫৬</sup>

অন্যদিকে পৌরুষত্বহীন ভীর্ণদুর্বল মেরু মজ্জার অধিকারী আত্মনিমগ্ন, স্বার্থপর মানুষ নামের ক্লীব জীবদের বিরুদ্ধে কবির গভীর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে “আনোয়ার” কবিতায়ঃ

আনোয়ার! আনোয়ার!  
বুক ফেড়ে আমাদের কলিজাটা টানো, আর  
খুন কর - খুন কর তীক্ষ্ণ যত আনোয়ার।<sup>৫৭</sup>

কবিতায় কথিত ‘যত জানোয়ার’ মূলত পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ সমগ্র দুনিয়ার ব্যক্তিত্বহীন, প্রতিকার-প্রতিবাদহীন মুসলিম জনগোষ্ঠী। এদেরকেই নজরুল অভিহিত করেছেন ‘পোষা জানোয়ার’, ‘ফ্যাণা জানোয়ার’ -বলে।

বিদ্রোহীঃ আমিহের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

আনোয়ার! আনোয়ার!

সব যদি সুম সাম, তুমি কেন কাঁদ আর?

দুনিয়াতে মুসলিম আভ পোষা আনোয়ার।<sup>৫৮</sup>

আত্মপ্রত্যয়হীন, পৌরুষত্বহীন, স্বাধীনতা কামনাহীন এই মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ এত তীব্র ছিল যে আনোয়ার-এর উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শঃ

যে বলে সে মুসলিম --- জিত ধরে টানো তার।

বেঈমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার।<sup>৫৯</sup>

জান বাঁচানোর চেয়ে মান বাঁচানো যে অনেক বড় ও মহৎ ব্যাপার তাতে কোন সন্দেহ নেই। “রণ-ভেরী” কবিতায় কবিও তাই বলেন, “তোর জান যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়।”<sup>৬০</sup>

কোরবানী “কবিতাতেও একই ব্যাপার ঘটে। নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান যে কোরবানী, তার মধ্যেও কবি শক্তিরই অন্বেষণ করেন। তাঁর অনুভবে” হত্যা নয় আজ ‘সত্য-গ্রহ’ শক্তির উদ্বোধন।”<sup>৬১</sup>

“কাজ না আজিকে জান মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধরণ?”<sup>৬২ক</sup>

মূলত “খুনের খুটিতে কল্যাণ কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ?”<sup>৬২খ</sup>

সুতরাং ভেঙে আবার গড়তে জানে যে ‘চির সুন্দ’ নজরুল তারই প্রতীক। সৃষ্টি-সুখের উল্লাসেই তাঁর ভাঙার গান গাওয়া। তাই ‘অগ্নিবীণা’ থেকে দোলন চাঁপার প্রেমের কবিতায়, কবির যে উত্তরণ, তারও মুখবন্ধে “গগণ ফেটে চক্রে ছোটে, পিনাকপাণির শূল আসে।”<sup>৬২</sup>

২.২ নজরুলের একটি বিশিষ্ট কাব্য গ্রন্থ “বিষের বাঁশী।” ‘অগ্নি-বীণা’র অগ্নিগর্ভ আত্মপ্রত্যয়, মানব হিতৈষণা ও আহংবোধ’ বিষের বাঁশীতেও সমভাবে প্রবহমান। নজরুলের সংগ্রামী চেতনা ‘বিষের বাঁশীতে’- এসে বরং নতুন মাত্রা পেয়েছে। এ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘আয়রে আবার আমার চিরতিক্ত প্রাণ’ এ কবি ‘ক্ষুদ্র প্রেমের শুদ্রামি’<sup>৬৩</sup> ছেড়ে ‘অগ্নি-বাণ’<sup>৬৪</sup> ধারণের আহ্বান জানিয়েছেন। ব্যাখ্যা করেছেন পরহিতে নিবেদিত প্রাণ দ্রোহ চরিত্রের স্বরূপঃ

তোর তরে নয় শীতল ছায়া;

পাশ্চ তরুর - প্রেম-আসার

তুইযে ঘরের শান্তি শত্রু,

রুদ্র শিবের চন্ড মার।

প্রেম-স্নেহ তোরা হারাম যে রে

## সাহিত্যিকী

কম্বাই কঠিন তুই পাষণ।  
সাপ ধরে তুই চাববি বুকে  
সইবে না তোর ফুলের ঘা,  
মারতে তোকে বাজ পারে লাজ  
চুমুর সোহাগ সইবেনা।”৬৫

এমন বজ্রাদপি পাষণ কঠিন নির্মম সত্য সেবীর “শ্বাস যদি হয় শেষ”৬৬ তবুও সে  
“সুটশাসনে করতে শাসন” ৬৭ থাকবে অকুতোভয়, উন্নত শির।

এরাই হবে জাতির প্রকৃত সেবক, “শির-দাঁড়া যার শক্ততাজা, রক্ত যাহার  
অরুণ”।৬৮ “সত্য মুক্তি-স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের” - তাদেরই কণ্ঠে বজ্র-নির্ঘোষে  
উচ্চারিত হবে” বন্দী থাকা হীন অপমান।”৬৯

এইভাবে কবি “দাসত্বের ঘন্যতৃপ্তি” ৭০ ও “ভিক্ষকের লজ্জাবৃত্তি”৭১ - থেকে  
জাতিকে মুক্ত এবং সেই সঙ্গে পরাধীন ভারতবাসীর মনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র  
ক্ষোভ ও প্রচণ্ড ঘৃণা সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন।

বলেছেন :

এস বিদ্রোহী মিথ্যা সূদন আত্ম শক্তি- বুদ্ধ বীর!  
আনো উলঙ্গ সত্য কৃপাণ, বিজলি ঝলক ন্যায় অসির।”৭২

২.৩ নজরুল যে শুধু পরারাজ্য লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনী শক্তির বিরুদ্ধে  
আপোষহীন সংগ্রামের বাণী উচ্চারণ করেছেন, তা নয়। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, জাত-পাতের  
মিথ্যা অহংকার, হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ প্রভৃতি বিষয়েও ব্যক্ত করেছেন তীব্র ক্ষোভ, শাণিত  
শ্লোষ :

জাতের নামে বজ্রাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া  
ছুঁইলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া”।৭৩

নজরুলের বিবেচনায় ভারতবাসীর জাতিভেদ-বুদ্ধি, বর্ণাশ্রম প্রথা এবং স্পৃশ্য-  
অস্পৃশ্য বোধই এদেশের সর্বকার সর্বনাশের মূল কারণ। ছোঁয়া ছুঁয়ির প্রশ্নে বর্ণবৈষম্যের এই  
ত্রাহী চিৎকারকে নজরুল অভিহিত করেছেন, “জাত শেয়ালের হুঁকা হুয়া”৭৪ বলে। এদেশে  
এখন আর মানুষ নাই, “আছে শুধু জাত শেয়ালের হুঁকা হুয়া।”৭৫। তাঁর ভাষায় “হুকোর জল  
আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,/ তাইত বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে  
একশ’ খান।”৭৬

যে জাত ধর্ম ঠুনকো এত  
আজ নয় কাল ভাঙবে সেত,  
যাক না সে জাত আহান্নমে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া।”৭৬

বিদ্রোহীঃ আমিদের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

নজরুলের এ বলিষ্ঠ উক্তি পেছনে কাজ করেছে তাঁর উদার, মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, কল্যাণী ও পবিত্র দৃষ্টি। ‘সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্ব মায়ের ঘর, মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম পর’।<sup>৭৭</sup> এ জন্যেই প্রশ্ন কবির :

বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন সে জাত?  
কোন ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁয়া অঙচি হন জগন্নাথ?  
নারায়ণের ভাত যদি নাই  
তোদের কেন জাতের বালাই?<sup>৭৮</sup>

জবাব নেই এসব প্রশ্নের। তবুও অন্ধবিশ্বাস আর কৌলীণ্যের দুর্জয় মোহে মানুষ মানুষকে ছোট করে দেখে, ঘৃণা করে এবং একই সঙ্গে দেবতা বা স্রষ্টার উদ্দেশ্যে অর্পণ করে নৈবেদ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি, পূজা। মানব আচরণের এ এক চরম অসঙ্গতি ও হাস্যকরতা! বিষয়টি নজরুলের দৃষ্টিতে গাভী মেরে জুতো দানের মত। তাঁর ভাষায়ঃ

(তোরা) ছেলের মুখে পুথু দিয়ে মা’র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া!”<sup>৭৯</sup>

এই স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিষয়টি যে শুধু হিন্দু-সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ বর্ণপ্রথার অভিধানে সীমাবদ্ধ, তা নয়; জাতিগত কৌলীণ্যেও তা পরিব্যাপ্ত। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুসমাজ নিজেদেরকে আর্য বংশোদ্ভূত মনে করে পৃথিবীর অন্য সকল ধর্ম সম্প্রদায় ও জাতিকে অচ্ছুত এবং অনার্য বলে ঘৃণা করতে অভ্যস্ত। ফলে জাতিগত অস্পৃশ্যতা বোধটিও হিন্দু সমাজ উদ্ভাবিত একটি উৎকট-মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে নজরুলের সমকালে ভারতবর্ষের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এরা হয়ে প্রতিপন্ন করতে সদা তৎপর ছিল। একারণে ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতার প্রশ্নে কাংশিত হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক মিলন কিছুতেই সম্পন্ন হচ্ছিল না। ‘যুগবাণী’ (১৯২২) র “ছুৎমার্গ” প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে নজরুল বলেনঃ

আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়া ছুঁয়ের জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোন ধর্মেরই অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কোন ধর্ম সম্পক্ষে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কেননা একটা ধর্ম কখনো এত সঙ্কীর্ণ অনুদার হইতেই পারে না। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এখানেই বুঝা যায় যে, কোন ধর্ম শুধু কোন এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের আর এই ছুৎমার্গ যখন ধর্মের অঙ্গ নয়, তখন নিশ্চয়ই ইহা মানুষের সৃষ্টি বা বোদার উপর বোদকারী। মানুষের সৃষ্টি-শৃঙ্খলা বা সমাজ বন্ধন সাময়িক সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা তো শাস্ত সত্য হইতে পারে না। এই জন্যই “সত্ত্বামি যুগে যুগে” রূপ মহাবাহীর উৎপত্তি।

## সাহিত্যিক

আমাদেরও হাদিসে সেইজন্য প্রতি শতবর্ষে একজন করিয়া “মুজাদিস” বা সংস্কারক আসেন বলিয়া লিখিত আছে। “বেদাৎ” বা মানুষের সৃষ্ট রীতিনীতির সংস্কার করাই এই সংস্কারকদের লক্ষ্য।

হিন্দু ধর্মের মধ্যে এই ছুইশ্রমার্গ রূপ কুঠরোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানিনা, কিন্তু উহা যে আমাদের হিন্দুভ্রাতৃদের মত একটা বিরাট আত্মিক অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নিবীৰ্য্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আমরা ভাইয়ের অধিকারের জোরে জোর করিয়া বলিতে পারি। আমরা যে তাঁহাদের সমস্ত সামাজিক শাসন বিধি একদিনেই উল্টাইয়া ফেলিতে বলিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু যে সত্য হয়ত একদিন সামাজিক শাসনের জন্যই শৃঙ্খলিত হইয়া ছিল, তাহার আর কি মুক্তি হইবে না? বাঙলার মহাপ্রাণ মহাতেজস্বী পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভারতে যেদিন হইতে এই “ম্লেচ্ছ” শব্দটার উৎপত্তি সেই দিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়। মানুষকে এত ঘৃণা করতে শিখায় যে ধর্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম নয়, ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি।”<sup>৮০</sup>

বস্তুর ঘটনাও তাই। হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার মূলে এই ম্লেচ্ছতা; রবীন্দ্রনাথ একে উপমিত করেছেন “ন্যাজ”-এর সাথে। ভেতরের ন্যাজ। গুরুদেব নাকি নজরুলকে বলেছিলেন : দেখ, যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজ কে কাটবে কে?”<sup>৮১</sup>

সত্যি তো! আবার “ন্যাজ যাদেরই গজায়- তা ভিতরেই হোক আর বাইরেরই হোক- তারাই হয়ে ওঠে পশু” এবং এই পশুরাই বাঁধায় মারামারি, আক্রমণ করে একে অপরের বিরুদ্ধে ধারালো প্রকট নখ দস্ত নিয়ে। মূলত এসবই সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা, মসজিদ-মন্দিরের কোন্দল। এর একটি চমৎকার, হৃদয়গ্রাহী যুক্তিনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন নজরুল “রুদ্রমঙ্গল”-(১৯২৭) এর “মন্দির ও মসজিদ” প্রবন্ধে। প্রাসঙ্গিক খানিকটা উদ্ধৃত করছিঃ

“মারো শালা যবনদের!” “মারো শালা কাফেরদের!”-আবার হিন্দু-মুসলমানী কান্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভে হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর ‘প্রেক্ষিত’ রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারা যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম- তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, “বাবা গো, মাগো।” মাতৃ-পরিত্যক্ত দুটি ভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে! দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণদেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির কলঙ্কিত হইয়া রহিল।”<sup>৮২</sup>

## বিদ্রোহীঃ আমিদের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

এসব বিভৎস কাণ্ড দেখে নজরুলের সঙ্গত কারণেই মনে হয়েছে :

মানুষ আজ পদতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা হুলেছে। পতর ন্যাস গভিয়েছে  
ওদের মাথার ওপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুপ্তিকে, মারছে নেস্টোটিকে; মারছে টিকিকে,  
দাড়িকে। বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মুখদের মারামারির কি অবসান নেই।”<sup>৮৩</sup>

এতো গেল এক দিক, হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ। এই  
ধর্মোদ্ধতার অন্য দিকও আছে, সেটা হচ্ছে ধর্মের নামে বজ্জাতি, ব্যবসাদারী, এটিও  
নজরুলের প্রাথমিক দৃষ্টিকে বিদ্ধ করেছে। নজরুল লক্ষ্য করেছেন অনেক ধর্ম -খাগী ধর্মের  
নাম ভাঙ্গিয়ে জাগতিক সাফল্য হাসিলে তৎপর আবার কখনও বা জঘন্য নোংরা নারী  
লোলুপতায় লিপ্ত। অনুরূপ একটি বিষয় নিয়ে নজরুল রচনা করেছিলেন ‘ভাঙার গান’ (শ্রাবন,  
১৩৩১) কাব্যের একটি বিখ্যাত গান “মোহান্তের মোহ-অন্তের গান।” এ সম্পর্কে ডঃ সুশীল  
কুমার বলেনঃ

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার পর তারেকেশ্বরের দুর্নীতিপরায়ন অসচ্চরিত্র ধর্মব্যবসায়ী  
মোহন্তকে তাড়াবার নিমিত্ত একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। নজরুল এই সময় “মহান্তের মোহ-  
অন্তের” গান লিখে এই আন্দোলনকে সমর্থন ও শক্তিশালী করেন।”<sup>৮৩</sup>

মোহের যার নাইক’ অন্ত

পুজারী সেই মোহান্ত

মা-বোনে সর্বস্বান্ত করছে বেদী মূলে।

.....

এই সব ধর্ম-খাগী

দেবতায় করছে দাগী,

মুখে কয় সর্বত্যাগী ভোগ-নরকে বসে।”<sup>৮৪</sup>

২.৪ শোষণের রকম ফের যতই থাক, তার পরিণতি একই -- শোষিতের দুর্ভোগ,  
তার অর্থনৈতিক মেরুমজ্জা ভেঙে দেয়া। এদিক থেকে ধর্মীয় শোষণ ও অর্থনৈতিক শোষণ  
তুল্যমূল্যে বিচার্য। সবরকম শোষণের বিরুদ্ধেই নজরুলের বিদ্রোহ ছিল আপোষহীন।  
নির্যাতিত সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনাকে নজরুল নিজের তিক্ত জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে  
উপলব্ধি করেছিলেন, “মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে।”<sup>৮৫</sup> আর এও  
উপলব্ধি করেছিলেন যে বিত্তহীন রিক্ত-বঞ্চিত, যারা জনপ্রিয়ভাবে সর্বহারা বলে পরিচিত,  
তাদের চাহিদা নিলোভ-যৎসামান্য, জীবন ধারণের নূন্যতম উপকরণ মাত্র কিন্তু তাও অনায়াস  
লভ্য নয়, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় সংগৃহীত। তাঁর ভাষায়ঃ

## সাহিত্যিকী

হীরা মানিক চাসনিক' তুই  
চাসনি ত সাতফোর  
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র-  
ডরা অভাব তোর,  
চাইলি রে ঘুম শান্তি হরা  
একটি ছিন্ন মাদুর ডরা  
একটি প্রদীপ আলো করা  
একটু কুটির দোর।"৮৬

তবুও বার বার এদেরই ঘরে হানা দেয় 'সিঁদেল-চোর, 'রাজার হস্ত করে সমস্ত  
কাঙালের ধন চুরি।"৮৭ আসে মৃত্যু আসে জরা। "চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণ কারীর  
জাত/ জোঁকের মত শুষছে রক্ত কাড়ছে থালার ভাত"।৮৮

নজরুলের দুঃখ এইখানে যে 'জনগণে যারা জোঁকসমশোষে তারে মহাজন  
কয়,/সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয়।" ৮৯ কবির অনুভবে মূলত এঁরাই  
'ধড়িরাঙ্গ',৯০ 'কষাই'। ৯১

এঁদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন কবি এবং সেই সঙ্গে  
স্রষ্টার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছেন সঙ্গত ফরিয়াদঃ

তোমার দত্ত হস্তের বাঁধে কার নিপীড়ন-চেড়ী?  
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ি?"  
ক্ষুধা-তৃষা আছে, আছে মোর প্রাণ  
আমিও মানুষ, আমিও মহান!"৯৩

'আমিও মানুষ আমিও মহান'৯৪-এই বোধ থেকে শোষিত মানুষের বোধীতে  
চৈতন্যের পবিত্র বারিধারা সিঞ্জন-ই নজরুলের কাব্য প্রেরণার অন্যতম উদ্দেশ্য। একই  
কারণে শোষক শ্রেণীর উদ্দেশ্যে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ জিজ্ঞাসা :

বেতন দিয়াছ?- চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!  
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল!  
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,  
রেলপথে চলে বাষ্প শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,  
বলত এসব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা  
কার খুনে রাজ্য?৯৫

বিদ্রোহীঃ আমিদের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

সাদা চোখে ঠুলি খুলে দেখলে বোঝা যাবে “ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট অট্টালিকার  
মানে”। ৯৬ অনুভব করা যাবে শোষণের ইতিহাস “প্রতি ইটে আছে লিখা।” ৯৭ সুতরাং

“তুমি শুয়ে রবে তেতলার’ পরে, আমরা রহিব নিচে  
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আশ্রি মিছে।” ৯৮

শুধু কি তাই? সমাজমনস্ক ও ইতিহাস সচেতন কবি একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করেন  
“আসিতেছে শুভ দিন, দিনে দিনে বহুবাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ”। ৯৯

#### ২.৫ কাব্যকলার গঠন কৌশল ও বাক-নির্মিতির স্বাতন্ত্র্যঃ

একজন কবি শুধু কুথার বীণা বাদকই নন, শিল্পী এবং স্থপতিও। কাজও তাঁর  
তিনটি। কবির কাজ। শিল্পীর কাজ। স্থপতির কাজ। ভাব থেকে মনন এবং মনন থেকে রূপ  
ও রূপকে নিরন্তর তাঁর যাতায়াত। কবির মানস স্তরে ভাবের যে দোলা লাগে কথার পর কথা  
সাজিয়ে তিনি তাকে রূপ দেন অবয়বে। এখানেই তাঁর স্থপতির কাজ। অলংকারিক ভাষায়  
যাকে আমরা বলি রূপক। কবি সেই রূপকেরই রূপকার। কথার মালাকার। ভাবের স্থপতি।  
রূপক তাঁর ভাষা। প্রতীক ভাবপ্রকাশের বাহন। কবিকে বুঝতে হলে, তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ  
অন্বেষণ করতে হলে রূপক-প্রতীকের মর্ম উদ্ঘাটন তাই অনিবার্য। রূপক প্রতীক ব্যতীত  
কাব্যের রূপ খোলে না। তার শ্রীঅঙ্গে লাগেনা কমণীয়তার দোলা। ও দুটিই আসল কাব্যশ্রী।  
অন্য কথায় রূপককে বলা যায় প্রতিমা। বাক-প্রতিমা। ভাবকে ব্যক্তিত্বে রূপায়িত করে গড়ে  
তোলা হয় এই প্রতিমা। অর্থাৎ কাব্যে নরাত্ম আরোপেই সৃজনশীল কবি প্রতিভা বিভাসিত।  
সৃজনশীল প্রতিভাবান মৌলিক কবিত্বশক্তির অধিকারী প্রত্যেক কবিরই কমবেশী বাক-নির্মাণ  
বৈশিষ্ট্য, রূপক সৃষ্টি ও প্রতীকায়ণের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য  
চমকপ্রদ এবং শক্তি অবিশ্বাস্য। তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বের মতই তাঁর রূপক-প্রতীক,  
personification অপূর্বদ্যুতিময়। এখানেও নজরুল Unique Individual. তাঁর  
এই Unique Individulity ‘রাঙাজবা’, ‘দেবীস্তুতি’ ‘হরপ্রিয়া’ প্রভৃতি পৌরাণিক  
উপাখ্যানকে রূপকাশ্রয়ী করে চারিত্র শক্তির প্রতিমা সৃজনে যত্নশীল। এসবে কবি অভিপ্রেত  
কল্যাণী শক্তি দেবতার চিত্রকল্পে বাজায়। ‘দেবীস্তুতি’ কবির প্রতিমা পূজা নয়, ‘রাঙাজবাও’  
নয় কালী আরাধনা। ১০০

অনুরূপ ভাবে মহাবীর খালেদ, খলিফা ওমর প্রভৃতি মুসলিম মনীষীদের নিয়ে  
নজরুলের যে কাব্য-স্মৃতি, তাও ব্যক্তি পূজা নয় কিংবা পীরতন্ত্রের স্মারকও নয়। বরং এসব  
ক্ষেত্রেও নজরুলের অন্বেষণ চরিত্র-শক্তির অভূতপূর্ব মহিমা।

## সাহিত্যিক।

এই পর্যায়ে ধর্মীয় উপাখ্যান কবিতার শরীর নির্মাণে ব্যবহার মুসলিম কবিদের মধ্যে নজরুলের হাতেই প্রথম। তিনি শুধু পথিকৃতই নন; বরং তাঁর প্রতিভার বড় কৃতিত্বই এটি।

হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মে বহু পৌরাণিক উপাদান আছে। ধর্মের নামে প্রচলিত হলেও সেগুলো ধর্ম নয়। উপকাহিনী মাত্র। এই সমস্ত ধর্মাশ্রয়ী পুরাণ কাহিনীর বিস্তৃত প্রেক্ষাপট অবলম্বন করে কাব্য রচনা শুধু সম্ভবই নয়- কল্পনার পক্ষ বিস্তারও সম্ভব ইচ্ছেমত। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রথিতযশা প্রতিভাবান কবিরাতো বটেই- অনেক হিন্দু কবি-ই কাব্যে ক্ষেত্রে এই সুযোগের সদ্যবহার করে চিত্রবৈচিত্র্যে ভরে তুলছিলেন কাব্য ফসল। কিন্তু ইসলাম নির্জলা তত্ত্বাশ্রয়ী ধর্ম হওয়ায় মুসলমান কবিদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছিলনা। তাছাড়া ইসলামে কোন পুরাণ কাহিনী নেই। নেই কল্পকাহিনী স্ফীত উপকথার বিস্তৃত উপকরণ। নিছক তত্ত্ব নিয়ে কবিতা রচনা কঠিন। তাতে কাব্যশ্রীও খোলেনা। কাব্য কবিতার জন্য সত্যের সাথে কল্পনার মিশ্রণ দরকার। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যাবতীয় করণীয় কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান আছে ইসলামে। স্বাধীন কল্পনা সম্ভব নয়। এসমস্ত কারণে মুসলমান কবিরা হিন্দু কবিদের পাশাপাশি নিজেদের জাতীয় মহিমা প্রাণময় করে প্রকাশ করতে অসুবিধা বোধ করছিলেন। এই অসুবিধার হাত থেকে মুসলমান কবিদের নজরুল শুধু নিষ্কৃতিই দিলেন না নিষ্প্রাণ কাব্যেও প্রাণের সঞ্চার করলেন তিনি।

কাজটি দুর্লভ। এই দুর্লভ কর্মকে তিনি প্রধানত তিনটি উপায়ে সফল করে তুললেন। প্রথমত ধর্মীয় আবেগকে ব্যাহত না করে ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জ থেকে এমন সব কাহিনী বা ব্যক্তিত্ব বেছে নিলেন তিনি- যা তাঁর বক্তব্যকে জোরালো, সরস ও আকর্ষণীয় করে তোলে এবং মোহনীয় চিত্রকল্প সৃষ্টি করে পাঠককে ধরে রাখা সম্ভব হয়। এই পর্যায়ে চরিত্র হিসেবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ‘খালেদ’, ‘ওমর’ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গ। এঁরা অতি মানুষ নন; মহৎ মানুষ -- কর্মে, উদ্দীপনায় নিষ্ঠায়, মানবতায়, ব্যক্তিত্বে, দেশ হিতৈষণায় এবং সর্বমানবে কল্যাণকামীতায়। সর্বোপরি উন্নত শির, স্বাধীন সত্তার কালজয়ী ব্যক্তিত্বপুরুষ বলে এরা নজরুলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব। “খালেদ! খালেদ! রি রি করে বুকে পরাধীনতার ব্যথা”-ই ‘খালেদ’ কবিতায় প্রকৃত ব্যথা নজরুলের। এজন্যই স্বাধীনতার হস্তারা কবির হাতে উপমিত হয় ‘হিন্দাবুড়ী’ বলে।

খালেদ! খালেদ! জিন্দা হয়েছে আবার হিন্দা বুড়ী;  
কত হামজারে মারে যাদুকরী দেশে দেশে ফেরে উড়ি।”<sup>১০০(ক)</sup>

### বিদ্রোহী: আমিভূতের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

দ্বিতীয়তঃ বক্তব্যের পরিপোষক হতে পারে এমন ধর্মীয় উপাদানগুলোকে তিনি কবিতার বাকপ্রতিমা সৃজনে ব্যবহার করতে লাগলেন। সৃষ্টি করলেন নতুন নতুন উপমা-রূপক।

এবং তৃতীয়তঃ ধর্ম নয় অথচ ধর্মের নামে প্রচলিত গালগল্পগুলোকে তিনি নিপুণ বিন্যাসে কবিতায় তুলে আনলেন। ব্যবহারিক সার্থকতা দেখালেন এগুলোর। কাব্য ভাবনায় বিস্তার ঘটালেন বিশ্বয়করভাবে। উজ্জ-বেন-ওনক-এমন একটি প্রচলিত গালগল্প। একই কবিতায় হিন্দু-মুসলমান ঐতিহ্যের সমন্বিত পরিভাষা ব্যবহার করেও কবি ধর্মীয় আবেগ থেকে পাঠককে মুক্তি দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন ভাবের স্বাধীন লোকে। প্রতিষ্ঠিত করলেন ইঙ্গিত ব্যঞ্জনা। অবিশ্রম একক ধর্মীয় পরিভাষার ক্ষেত্রেও এসত্য সমভাবে প্রযোজ্য। বস্তুত নজরুলের কবি প্রতিভার এইটি-ই সবচেয়ে বড় দিক। এ জন্যেই কবি প্রত্যাশিত ভারতের বৈপ্লবিক উত্থান নিমিষেই পৌরাণিক 'সাব্যসাচী' হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগকারী ব্যক্তির সম্মানিত হন 'দধীচি' বলে এবং পরক্ষণেই দৃশ্যপট পাল্টায় কবি বক্তব্যের অনুকূলে-

“অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই  
দানব দৈত্য তবু মরে নাই,  
সূতা দিয়া মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি  
জাগোরে জোয়ান। বাত ধরে মিথ্যার তাঁত বুনি।”

এই যে, একই সংগে পৌরাণিক পরিভাষা স্বাধীনতার পক্ষে এবং চরকা আন্দোলনের অসারতা প্রমাণের জন্য ব্যবহার “ বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি” নজরুলের বিশ্বয়কর প্রয়োগ নৈপুণ্যের এক অত্যাশ্চর্য উদাহরণ।”<sup>১০১</sup> অত্যাশ্চর্য বটে কিন্তু আকস্মিক নয়। আকস্মিক নয় এর কারণে যে ‘অগ্নিবীণা’র “বিদ্রোহী” কবিতায় যার সাহসী সূত্রপাত-- পরিণত কাব্য জীবনে তা মহীরুহে প্রাণবন্ত।

বস্তুত ‘বিদ্রোহী’ নজরুলের সমগ্র কবি সত্তার সংহত একটি বাণী মূর্তি। তাঁর পরবর্তী কাব্য চর্চার বহুব্যাপ্ত প্রতিফলনে ক্রমাগত তা পূর্ণতাভিলাষী। বর্ণবৈচিত্র্যে, রেখা বিন্যাসে, অলংকরণে, ব্যাখ্যায় এবং বিশ্লষণে এই কবিতাটির মধ্য দিয়েই কবি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ব্যাপকতর গভীরতায়। সুতরাং নজরুলকে চেনার, নজরুলকে জানার এবং তাঁর সামগ্রিক কাব্যাদর্শ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে ‘বিদ্রোহী’র ভূমিকা অপরিসীম।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা জরুরি যে, “খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া উঠিয়াছি চির বিশ্বয় আমি বিশ্ব-বিধাতীর”<sup>১০২</sup> বলে নজরুল যে অহংকার ব্যক্ত করেছেন, তাকেই নানা দিক

## সাহিত্যিকী

থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনে নজরুল নিজেকে উপমিত করেছেন” মহাপ্রলয়ের নটরাজ, '১০৩' ভীম ভাসমান মাইন, ১০৪ 'ধূর্জটি, ১০৫ 'ইন্দ্রানী-সূত', ১০৬ 'কৃষ্ণকণ্ঠ', ১০৭ 'ব্যোমকেশ', ১০৮ 'বেদুঙ্গন', ১০৯ 'চৈঙ্গিস', ১১০ 'ইস্রাফিলের শিঙার মহাহুঙ্কার', ১১১ 'পিনাকপাণির ডমরু ত্রিভুজ', ১১২ 'ধর্মরাজের দন্ত', ১১৩, 'চক্র ও মহাশঙ্ক', ১১৪, 'ক্ষ্যাপা দুর্বাসা বিশ্বামিত্র শিষ্য', ১১৫, 'তাজি বোররাক', ১১৬, 'উচ্চৈঃ শ্রবা', ১১৭ অফিয়াসের বাঁশরী', ১১৮, 'শ্যামের হাতের বাঁশরী', ১১৯, 'ছিন্ন মস্তা চন্ডী', ১২০, 'রণদা সর্বনাশী', ১২১, 'জগদীশ্বর', ১২১, 'পরশুরামের কঠোর কুঠার', ১২২, 'হল বলরাম স্বন্ধে', ১২৩, 'বিদ্রোহী ভৃগু', ১২৪, 'প্রভৃতি কোরান-পুরাণিক-গ্রিক পরিভাষায়। নিজেকে দেখার, নিজেকে চেনার ও নিজের বহুগামী ব্যক্তির অনুষ্ণ রূপে নজরুলের কবিচেতনায় এগুলো একাত্ম। এসবের পৌরাণিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখলে নজরুল মানসের ব্যাপ্তি, তাঁর আত্মবিশ্বাস, অহংবোধ এবং বহুবিধ ঐতিহ্য আত্মীকরণে তাঁর তীব্রতর ইচ্ছা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মধ্যে ভার্সাটাইল জিনিয়াসনের লক্ষণ।

অনেকেই তাঁর স্ববিরোধী কবি সত্তার সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু পরস্পর বিরোধী গুণাবলী ও বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন বহু মানুষের সন্ধান পৃথিবীর ইতিহাসে দৃষ্টিগোচর হয়। খণ্ড দৃষ্টিতে তাঁদের চরিত্রের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্ববিরোধী মনে হলেও অখণ্ড ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে সে সবার মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। একই সঙ্গে একজন মানুষ হতে পারেন ব্যক্তিগতভাবে প্রেমিক-রোমান্টিক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বিদ্রোহী-বিপ্লবী। শত্রুপক্ষের ত্রাস সৃষ্টিকারী অপরাজেয় সেনাধ্যক্ষও হতে পারেন সংবেদনশীল প্রেমিক। তাঁরও থাকতে পারে ব্যক্তিগত মানসী তিলোত্তমা; ব্যক্তিগত প্রেমিকা। উদাহরণ স্বরূপ নেপোলিয়ান বোনাপার্টের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রেয়সী প্রেমাম্পদার উদ্দেশ্য রণাঙ্গন থেকে যুদ্ধ পরিচালনারত নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নিয়মিত প্রেমপত্র রচনার তথ্য ঐতিহাসিক সত্য। যে বাঁধে সে যেমন চুলও বাঁধে, তেমনি যুদ্ধরত তরুণ বীর সেনানীও ব্যক্তিগত প্রেমের ধারা রাখতে পারেন অক্ষুণ্ণ। মনস্তাত্ত্বিকভাবে শুনতে পারেন স্বীয় প্রেমিকার 'কাঁকন চুড়ির কনকন'। ১২৫ স্বানেন্দ্রিয়েও পেতে পারেন নোনা মেয়ে মানুষের শারীরিক গন্ধ। এটি মোটেই দোষের কিছু নয়। বরং সংবেদনশীল মানব সত্তার অভিপ্রেত ও অপরিহার্য একটি মানবীয় গুণ। অতএব নজরুল যখন বলেনঃ

“মম প্রাণের পেয়ালা হৃদম হ্যায় হৃদম ভরপুর মদ” ১২৬

কিষ্ণা

“আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেণী, তব্বী নয়নে বহি,

## বিদ্রোহীঃ আশ্বিত্তের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

আমি ঘোড়শীর হৃদি সরসিজ প্রেম উদ্ভাস, আমি ধনি।”<sup>১২৭</sup>

অথবা

“আমি অভিমাত্রী চির ক্ষুধা হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,

চিত- চুয়ন- চোর কম্পন আমি থর থর থর প্রথম পরশ কুমারীর।

আমি গোপন প্রিয়র চকিত চাহনি ছল করে দেখা অনুধন

আমি চপল মেয়ের ভালবাসা তার কঁকন চুড়ির কনকন।”<sup>১২৮</sup>

তখন তাঁকে ছোট করে দেখার অবকাশ কোথায়? এবং কি করেই বা বলা যায় বিদ্রোহের তুর্ঘ্য় নিনাদের সঙ্গে সমতালে রোমান্টিক প্রেমানুভব ব্যক্ত করে নজরুল তাঁর বিদ্রোহী সত্তার মিথ্যা আশ্ফালনকেই প্রকট করে তুলেছে? প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তা নয়। নজরুলের এসব উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে তিনি যেমন প্রয়োজনে অসীম সাহসী, দ্রোহী, সংস্কারক, বিপ্লবী, তেমনি ভালোবাসায় মদিরাক্ত প্রেমিকও। প্রেমের জন্যই তাঁর যুদ্ধ। প্রেমময় সমাজ-সংসারের জন্যই তাঁর আমরণ সংগ্রাম।

নজরুল সঙ্গতই বলেছেন, “মম এক হাতে বাঁকা বাঁশরী, আর হাতে রণ তুর্ঘ্য়”।<sup>১২৯</sup> অতএব, বিদ্রোহীতে” দৃষ্ট আপাত স্ববিরোধীতা নজরুল চরিত্রের বৈপরীত্য নয়; বৈচিত্র্য। সীমাবদ্ধতা নয়, বিস্তার।

## তথ্য নির্দেশ

১. কাজী নজরুল ইসলাম, “বিদ্রোহী”, ‘অগ্নিবীণা’, নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, ২৫শে মে ১৯৯৩, পৃ: ১০
২. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৭
৩. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৯
৪. মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত, নজরুল সাহিত্য, ট্রয়েন্টওয়েজ, বাংলা, বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৩৭৭, পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮
৫. হায়াৎ মামুদ, জ্যোতি প্রকাশ দত্ত সম্পাদিত, কবি নজরুল প্রসঙ্গে: তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০, পৃ: ১৮১-১৮২
৬. প্রাণ্ডক্ত, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড পৃ: ১০
৭. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৭
৮. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৯
৯. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৮
১০. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৮
১১. প্রাণ্ডক্ত, “প্রলয়োদাস”, প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৬

## সাহিত্যিকী

১২. প্রাণ্ড, "বিদ্রোহী", প্রাণ্ড, পৃ: ৭
১৩. প্রাণ্ড, পৃ: ৮
১৪. প্রাণ্ড, পৃ: ৭
১৫. প্রাণ্ড, "ধূমকেতু", প্রাণ্ড, পৃ: ১৫
১৬. "দোলন চাপা", "আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে", প্রাণ্ড, পৃ: ৪৭
১৭. প্রাণ্ড, "সেবক", "বিষের বাঁশী", প্রাণ্ড, পৃ: ৯৯
১৮. প্রাণ্ড, "আজ্ঞাশক্তি", প্রাণ্ড, পৃ: ১০৮
১৯. প্রাণ্ড, "সৃষ্টি সুখের উল্লাস", "দোলন চাপা", প্রাণ্ড, পৃ: ৪৭
২০. প্রাণ্ড, পৃ: ৪৭
২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিদায়", "কল্পনা", রর ১. পৃষ্ঠা ৭২৪, ১ম বাংলাদেশ সুলত সংস্করণ।
২২. মুজফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, পৃ: ২৫১
২৩. প্রাণ্ড, পৃ: ২৫২-২৫৩
২৪. প্রাণ্ড, "নবযুগ", প্রাণ্ড, পৃ: ৮০৯
২৫. প্রাণ্ড, "গেনছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ", প্রাণ্ড, পৃ: ৮১৩
২৬. প্রাণ্ড, পৃ: ৮১১
২৭. প্রাণ্ড, "মহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে", প্রাণ্ড, পৃ: ৮১৮
২৮. প্রাণ্ড, পৃ: ৮১৯
২৯. প্রাণ্ড, "মুখবন্ধ" প্রাণ্ড, পৃ: ৮২৬
৩০. প্রাণ্ড, "রাজবন্দীর জবানবন্দী", প্রাণ্ড, পৃ: ৮৪৯
৩১. কাজী আবদুল মান্নান, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, মডার্ন লাইব্রেরী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৫, মার্চ ১৯৮৯ পৃ: ১৬১
৩২. প্রাণ্ড, নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার পটভূমি, প্রাণ্ড, পৃ: ২৫৪
৩৩. বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৪, পৃ: ১২৫
৩৪. আতাউর রহমান, নজরুল কাব্য সমীক্ষা, মুক্তধারা, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ: ১৯
৩৫. ঐ, পৃ: ১৯
৩৬. ঐ, পৃ: ১৯
৩৭. Scrajul Islam Choudhury. Introducing Nazrul Islam, Muktdadhara, Dacca, Second Edition. July, 1974. Page 27-28
৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "জন্মদিনে", কবিতার সংখ্যা ১০, রবীন্দ্র রচনাবলী ২৫শ খন্ড, বিশ্বভারতী, পুনমুদ্রণ, মাঘ, ১৩৯৫, পৃ: ৭৮।
৩৯. মুজফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ: ২৪০

বিদ্রোহীঃ আমিত্বের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

৪০. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, কলিকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ফে'জ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, পৃ: ৬৬
৪১. মুজফফর আহমদ, প্রাণ্ড, পৃ: ২৫৯
৪২. মুজফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, বাংলাদেশে ১ম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৭৩, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ: ২৫৯
৪৩. মুতাহা নূরউল ইসলাম, সমকালে নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ, অম্বহায়ণ, ১৩৯০, নভেম্বর ১৯৮৩, প্রতাবনা চৌদ্দ
৪৪. মোঃ হারুন-অর-রশীদ, 'নজরুল সাহিত্যে ধর্ম শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভ', ২য় অধ্যায়।
৪৫. প্রাণ্ড, ৮ম অধ্যায়।
৪৬. কাজী নজরুল ইসলাম, "বিদ্রোহী", 'অগ্নিবীণা', প্রাণ্ড, পৃ: ১০
৪৭. প্রাণ্ড, পৃ: ১০
৪৮. প্রাণ্ড, "প্রলয়োল্লাস", প্রাণ্ড, প্রাণ্ড, পৃ: ৬
৪৯. প্রাণ্ড, পৃ: ৫
৫০. প্রাণ্ড, পৃ: ৫
৫১. প্রাণ্ড, পৃ: ৫
৫২. প্রাণ্ড, "রক্তাশ্রু ধারিনী মা", প্রাণ্ড, পৃ: ১১
৫৩. প্রাণ্ড, "আগমনী", প্রাণ্ড, পৃ: ১৪
৫৪. প্রাণ্ড, "কামাল পাশা", প্রাণ্ড, প্রাণ্ড, পৃ: ২০
৫৫. প্রাণ্ড, পৃ: ২০
৫৬. প্রাণ্ড, পৃ: ২৩
৫৭. প্রাণ্ড, "আনোয়ার", প্রাণ্ড, প্রাণ্ড, পৃ: ২৯
৫৮. প্রাণ্ড, পৃ: ২৮
৫৯. প্রাণ্ড, পৃ: ৩০
৬০. প্রাণ্ড, "রণভেরী", প্রাণ্ড, পৃ: ৩১
৬১. প্রাণ্ড, "কোরবানী", প্রাণ্ড, প্রাণ্ড, পৃ: ৩৬
- ৬১ (ক) প্রাণ্ড, পৃ: ৩৮
- ৬১ (খ). প্রাণ্ড, পৃ: ৩৮
৬২. প্রাণ্ড, "আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে", 'দৌলন চাপা', প্রাণ্ড, পৃ: ৩৯
৬৩. প্রাণ্ড, "আয়রে আধার আমার চির তিষ্ঠ প্রাণ", 'বিষের বাঁশী', প্রাণ্ড, পৃ: ৯২
৬৪. প্রাণ্ড, পৃ: ৯২
৬৫. প্রাণ্ড, পৃ: ৯২
৬৬. প্রাণ্ড "সেবক", প্রাণ্ড, প্রাণ্ড, পৃ: ৯৯
৬৭. প্রাণ্ড, পৃ: ৯৯
৬৮. প্রাণ্ড, পৃ: ৯৯

## সাহিত্যিকী

৬৯. প্রাণ্ড, পৃ: ৯৯
৭০. প্রাণ্ড, "উদ্বোধন", প্রাণ্ড, প্রাণ্ড, পৃ: ১০৪
৭১. প্রাণ্ড, পৃ: ১০৪
৭২. প্রাণ্ড, "আত্মশক্তি", প্রাণ্ড, প্রাণ্ড, পৃ: ১০৭
৭৩. প্রাণ্ড, "জাতের বজ্জাতি", প্রাণ্ড, প্রাণ্ড, পৃ: ১১৬
৭৪. প্রাণ্ড, পৃ: ১১৬
৭৫. প্রাণ্ড, পৃ: ১১৬
৭৬. প্রাণ্ড, পৃ: ১১৬, ১১৭
৭৭. প্রাণ্ড, পৃ: ১১৭
৭৮. প্রাণ্ড, পৃ: ১১৭
৭৯. প্রাণ্ড, পৃ: ১১৭
৮০. প্রাণ্ড, "ছদ্মস্বর্গ", 'যুগবানী', প্রাণ্ড, পৃ: ৮২২
৮১. প্রাণ্ড, "হিন্দু-মুসলমান", 'রুদ্রমঙ্গল', প্রাণ্ড, পৃ: ৮৮৩
৮২. প্রাণ্ড, "মন্দির ও মসজিদ", 'রুদ্রমঙ্গল', প্রাণ্ড, পৃ: ৮৭৯
- ৮৩.(ক) প্রাণ্ড, "হিন্দু-মুসলমান", 'রুদ্রমঙ্গল', প্রাণ্ড, পৃ: ৮৮৪
৮৩. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, নতুন সংস্করণ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, ২৫ মে ১৯৯৩, পৃ: ৯০১
৮৪. কাজী নজরুল ইসলাম, "মোহান্তের মোহ অন্তের গান" 'ভাজার গান', প্রাণ্ড, পৃ: ১৪৭
৮৫. প্রাণ্ড, "আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে", 'দোলন চাপা', প্রাণ্ড, পৃ: ৪৮
৮৬. প্রাণ্ড, "সর্বহার", 'সর্বহার', প্রাণ্ড, পৃ: ২৮০
৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'দুই বিঘা জমি', 'কাহিনী', রর ১, ১ম সূম, ১লা পৌষ, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা ৬৭৯
৮৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কৃষাণের গান', 'সর্বহার', প্রাণ্ড, পৃ: ২৮১
৮৯. প্রাণ্ড, "ফরিয়াদ", 'সর্বহার', প্রাণ্ড, পৃ: ২৯০
৯০. প্রাণ্ড, পৃ: ২৯০
৯১. প্রাণ্ড, পৃ: ২৯০
৯২. প্রাণ্ড, পৃ: ২৯২
৯৩. প্রাণ্ড, পৃ: ২৯২
৯৪. প্রাণ্ড, পৃ: ২৯২
৯৫. প্রাণ্ড, "কুলি-মজুর", 'সাম্যবাদী', প্রাণ্ড, পৃ: ২৪৬
৯৬. প্রাণ্ড, পৃ: ২৪৬
৯৭. প্রাণ্ড, পৃ: ২৪৬
৯৮. প্রাণ্ড, পৃ: ২৪৬
৯৯. প্রাণ্ড, পৃ: ২৪৬
১০০. মোঃ হারুন-অর-রশীদ, 'নজরুল সাহিত্যে ধর্ম' শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভ, ৫ম অধ্যায়।

বিদ্রোহীঃ আমিত্বের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি

১০১.(ক) প্রাণ্ড,

১০১. প্রাণ্ড,

১০২. কাজী নজরুল ইসলাম, “বিদ্রোহী”, ‘অগ্নিবীণা’, প্রাণ্ড, পৃ: ৭

১০৩. প্রাণ্ড, পৃ: ৭

১০৪. প্রাণ্ড, পৃ: ৭

১০৫. প্রাণ্ড, পৃ: ৭

১০৬. প্রাণ্ড, পৃ: ৭

১০৭. প্রাণ্ড, পৃ: ৭

১০৮. প্রাণ্ড, পৃ: ৭

১০৯. প্রাণ্ড, পৃ: ৭

১১০. প্রাণ্ড, পৃ: ৭

১১১. প্রাণ্ড, পৃ: ৭

১১২. প্রাণ্ড, পৃ: ৮

১১৩. প্রাণ্ড, পৃ: ৮

১১৪. প্রাণ্ড, পৃ: ৮

১১৫. প্রাণ্ড, পৃ: ৮

১১৬. প্রাণ্ড, পৃ: ৯

১১৭. প্রাণ্ড, পৃ: ৯

১১৮. প্রাণ্ড, পৃ: ৯

১১৯. প্রাণ্ড, পৃ: ৯

১২০. প্রাণ্ড, পৃ: ২০

১২১. প্রাণ্ড, পৃ: ১০

১২২. প্রাণ্ড, পৃ: ১০

১২৩. প্রাণ্ড, পৃ: ১০

১২৪. প্রাণ্ড, পৃ: ১০

১২৫. প্রাণ্ড, পৃ: ৯

১২৬. প্রাণ্ড, পৃ: ৮

১২৭. প্রাণ্ড, পৃ: ৮

১২৮. প্রাণ্ড, পৃ: ৯

১২৯. প্রাণ্ড, পৃ: ৮